সংবাদ

তারিখ 3 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

কোচিং বাণিজ্য, প্রাইভেট টিউশনি, গাইড বই...

মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

সারাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে যখন জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছেছে, নানা আলাপ-আলোচনা-সমালোচনায় মুখর দেশের সচেতন মহল তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং, প্রাইভেট নিষিদ্ধ ঘোষণাসহ সব ধরনের নোট-গাইড বই, সহায়ক বা অনুশীলন বই প্রকাশের সুযোগ না রেখে শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কেউ জড়িত থাকলে জেল-জরিমানা এবং শিক্ষক হলে চাকরিচ্যুত করার বিধান রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি কোচিং রাজ্যে বসবাস করছে। স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়া হয়ে পড়ছে কোচিং-নির্ভর। দেশজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাই সাধারণত এখানে পাঠদান করেন। অনেক শিক্ষকের রয়েছে নিজস্ব কোচিং সেন্টার। শিক্ষায়তনে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হয় না। ফলে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীর মাঝেও লক্ষ্য করা যায় প্রবল অনীহা। এমন শিক্ষার্থীরও দেখা মেলে যারা সারা বছর ক্লাসে উপস্থিত না থেকে শুধু কোচিং সেন্টারে পড়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ক্লাসে শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি ও তার সারা বছরের কার্যলাপের ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিষয়টি তেমন বিবেচনায় আনা হয় না। এছাড়া ভর্তি বাণিজ্যসহ নানাবিধ দুর্নীতির কারণে শিক্ষাঙ্গন ক্রমাগত কলুষিত হচ্ছে।

দেশে বর্তমানে প্রায় পৌনে ২ লাখ কোচিং সেন্টার রয়েছে। সকালে-বিকেলে রাতে এমনকি স্কুল-কলেজ চলাকালীন সময়েও শিক্ষকদের কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। অনেক শিক্ষক বাসায় নিয়মিত ব্যাচ করে শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ান। শিক্ষকের বাসগৃহই রূপ নেয় কোচিং সেন্টারে। ফলে শিক্ষকের বাসা বা কোচিং সেন্টারের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খায় দেশের সব শিক্ষা কার্যক্রম। আর কোচিং বাণিজ্যের নামে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ। কোচিং বাণিজ্য থেকে অবৈধভাবে বছরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা আয় হয় বলে এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। কোচিং সেন্টারে লেখাপড়ার মতো যন্ত্রনির্ভর ব্যবস্থায় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা, জিপিএ-৫ পাওয়া অসম্ভব নয়। শিক্ষকরা যেভাবেই হোক শিক্ষার্থীর মগজের মধ্যে পাঠ্যক্রমের সীমিত বিষয়বস্তু ঢুকিয়ে দেন যা পরীক্ষার হলে কোনমতে উগড়িয়ে দেয়া একজন শিক্ষার্থীর জন্য সহজ হয়ে যায়। শিক্ষকরাই তাদের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত করেন, নির্দিষ্ট প্রকাশনীর বই কিনতে বাধ্য করেন। আর বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খ্যাতিমান শিক্ষকরাই তো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন পাবলিক ও নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার রয়েছে এন্তার অভিযোগ।

কোচিং সেন্টার-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত গাঁয়ের কোন স্কুলের কৃষক, শ্রমিকের সন্তানের পক্ষে খুব একটা ভালো ফলাফল করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের স্কুলে যোগ্য শিক্ষক নেই। নেই ভালো বইপত্র। গৃহশিক্ষক রেখে বা কোচিং সেন্টারে গিয়ে লেখাপড়ার সুবর্ণ সুযোগ বা সামর্থ্য কোনটাই তাদের নেই। কোচিং সেন্টারনির্ভর শহরকেন্দ্রিক লেখাপড়া ধীরে ধীরে বিত্তশীলদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। তাই রাজধানীর স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মফঃস্বল শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

এ কথা সত্য, বিগত সময়ের চেয়ে আজকাল পড়াশোনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। পাঠ্য বিষয়সমূহ হয়েছে উন্নত। সময়ের প্রয়োজনে পাঠ্যক্রমে অনেক প্রয়োগিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভালো পাঠ্যপুস্তক, কম্পিউটারসহ নানা সাহায্যকারী জিনিস শিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতিও হয়েছে। উঁচু উঁচু ভবন, দামি আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক পাখা, এমনকি প্রতিষ্ঠান প্রধানের রুমে এসি, অ্যাকুরিয়াম চলে এসেছে। চক, ডাস্টার, কালো বোর্ডের বদলে সেখানে এসেছে দামি হোয়াইট বোর্ড, মার্কিং কলম কত কি! এখন আর শিক্ষার্থীদের নাকে চকের ধুলো যাওয়ার ভয় নেই। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যানের বাতাস খেতে খেতে পাঠাভ্যাস করা সম্ভব।

এছাড়া শিক্ষকরাও আজ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে অনেকের। ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে আজ দূরত্ব কমেছে। গড়ে উঠেছে বন্ধুত্বের নিবিড় সম্পর্ক। কিন্তু শিক্ষকতা পেশার প্রতি শিক্ষকের ডিভোশানের অভাবে বাড়েনি শিক্ষার মান। বরং দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন আজ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকতা পেশা আর দশটা-পাঁচটা চাকরির মতো হয়ে গেছে। এখন আর শিক্ষকতাকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নন অনেকে। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে আসেন না। কেউ কেউ গতানুগতিকভাবে পাঠদান করেন। অনেক শিক্ষক পড়াতে গিয়ে ভালো টেক্সট বইয়ের সাহায্য পর্যন্ত নেন না। সস্তা নোট বই আর গোটি কতক প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদের লেখাপড়া। শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে পাঠ্যবিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো কি পারলো না তাতে শিক্ষকের কিছু যায় আসে না। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। শ্রেণীকক্ষের লেখাপড়ার এ ঘাটতি শিক্ষার্থীকে ঠেলে দিচ্ছে প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারের দিকে। অথচ পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলোতে কোচিং বলতে তেমন কিছুই ছিল না। এমোনকি গৃহশিক্ষক দিয়ে পড়ার ব্যবস্থাও ছিল একেবারে সীমিত। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসে বসেই তাদের লেখাপড়া সেরে ফেলতো। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক এমন ভাবে পাঠদান করতেন যে শিক্ষার্থীদের বাসায় গিয়েও খুব একটা পড়াশুনা করার প্রয়োজনও পড়তো না। শিক্ষকরা নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়া আদায় করে নিতেন। শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা হতো নিয়মিত। কোন শিক্ষার্থী মাঝেমধ্যে শিক্ষকের বাসায় গিয়ে পড়লেও তার বিনিময়ে শিক্ষককে সম্মানী দিতে হতো না। শিক্ষক এ কাজটিকে তার শিক্ষকতার অংশ হিসেবে মনে করতেন।

ইতিপূর্বে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত ৫ সদস্যের কমিটি প্রণীত খসড়া সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শ্রেণীর শিক্ষকের জন্য নীতিমালা জারি করা হয়। নীতিমালা ভঙ্গের অপরাধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ এমনকি শিক্ষকের চাকরিচ্যুতির মতো কঠোর শাস্তির বিধানও রাখা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত নীতিমালায় বলা হয়, শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে বা কোচিং বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারবেন না। তবে নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে পারবেন। প্রতি মাসে এ ধরনের কমপক্ষে বাড়তি ১২টি ক্লাসের জন্য মহানগর এলাকায় শিক্ষকরা প্রতি মাসে ছাত্রপ্রতি ৩০০ টাকা, জেলা পর্যায়ে ২০০ টাকা এবং উপজেলায় পর্যায়ে ১৫০ টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। এ থেকে ১০% অর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন খরচ বাবদ কেটে দিতে হবে। এছাড়া শিক্ষকরা প্রতিদিনই অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষার্থীকে বাসায় বসে প্রাইভেট পড়াতে পারবেন। নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজ মনিটরিং করার জন্য বিভাগীয় এলাকা, জেলা এবং উপজেলায় পৃথক কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এ সবের কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি, বন্ধ হয়নি কোচিং বাণিজ্য। হয়নি শিক্ষার মানোন্নয়ন। দেশে এতো জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মাত্র কতভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সে পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ দেয়।

এহেন পরিস্থিতিতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা হয়েছে, এসব নীতিমালা মেনে চলতে জারি করা হয়েছে সতর্কতামূলক নির্দেশনা। বড় বড় কোচিং সেন্টারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযানও পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। ভাড়া বাসায় কোচিং বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে অনেকক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কক্ষ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্টরা কোচিং বাণিজ্যের সনদ পেয়ে যায়। বেড়ে যায় কোচিংয়ের রমরমা ব্যবসা। প্রচলিত নির্দেশনা ও নীতিমালার দুর্বলতা অথবা তা বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতার কারণে কোচিং বন্ধ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বর্তমানের শিক্ষা আইনের কোচিং ও নোটবই বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক। তবে এর সঠিক বাস্তবায়নের ওপরই নির্ভর করবে আইনের সফলতা। পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হতে হবে। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে কোচিং-বাণিজ্যের মানসিকতা। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কোচিং সম্পূর্ণ বন্ধ করতে প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা জরুরি। বর্তমানে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত হলে পরবর্তীতে তা শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে শিক্ষকদের কৌশলী হতে হবে। সারাদেশের শিক্ষার মানের সমতা বজায় রাখতে মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষায়তনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থা ও তাদের পাঠগ্রহণের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষককে পাঠ্যবিষয়ের বিন্যাস (lesson plan) করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষায়তনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরকে নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে জোর তৎপরতা চালাতে হবে। সন্তানের লেখাপড়ার প্রতি মা-বাবা, অভিভাবকের হতে হবে যত্নশীল। সন্তান সুশিক্ষায় গড়ে না উঠলে জীবনের সব অর্জন ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিক্ষকতার মতো একটি মহান পেশার প্রতি সর্বস্তরের শিক্ষকদের হতে হবে শ্রদ্ধাশীল। পাশাপাশি শিক্ষক, শিক্ষার্থীর মাঝে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ বেতন কাঠামো উন্নীত করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে এনে শ্রেণীকক্ষে সুষ্ঠু পাঠদান নিশ্চিত করতে পারলে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হবে, উন্নত হবে শিক্ষার মান। শিক্ষকতা পেশা কখনো বাণিজ্য হতে পারে না- এমন মানসিকতা নিয়ে মেধাবী, সৎ, নিবেদিত প্রাণের মানুষ শিক্ষকতা পেশায় এলে শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারাই পাল্টে যাবে।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও গল্পকার]